**প্রশ্ন : কল্পবিজ্ঞান ও প্রোফেসর শঙ্কু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।**

**উত্তর :** পৃথিবীতে কল্পবিজ্ঞান গল্পের শুরু কীভাবে হয়েছিল, তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। বলা হয়, খ্রিস্টপূর্ব যুগেই প্লেটোর লেখা 'টাইমাস অ্যান্ড ক্রিটিয়াস'-এ হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ অ্যাটলান্টিসের বর্ণময় কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া ছিল। তারপর মধ্যযুগে কল্পবিজ্ঞানের ছোঁয়া পাওয়া যায় টমাস মোরের লেখা 'ইউটোপিয়া' গল্পে। অতঃপর উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সিস বেকনের 'দ্য নিউ অ্যাটলান্টিস', সুইফ্‌ট-এর 'গ্যালিভারস ট্রাভেলস', জোহানেস কেপলারের 'সমনিয়াম', রসট্যান্ডের 'ভয়েজেস টু দ্য মুন অ্যান্ড দ্য সান' ইত্যাদি গল্প।

আজ থেকে একশো বিরাশি বছর আগেকার কথা। তখন ১৮১৮ সাল। পি. বি. শেলির স্ত্রী মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট শেলি মাত্র ১৮ বছর বয়সে লেখেন একটা গল্প। নাম — 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন : অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস'। সেদিন কল্পবিজ্ঞানের যে-বীজটি মেরি শেলি বিশ্বসাহিত্যের জমিতে পুঁতেছিলেন, বর্তমানে তা পত্র-পুষ্প পল্লবিত করে বিশাল মহিরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। মেরি শেলির পর বিশ্বসাহিত্যে বিস্ময়কর কল্পনার স্পর্শে কল্পবিজ্ঞানকে আলোকিত করেন জুল ভের্ন। তিনি উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে শেষ অবধি কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে 'কল্পবিজ্ঞান'-কে উচ্চ শিখরে নিয়ে আসেন। তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প — টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্‌স আন্ডার দ্য সি, ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন ইত্যাদি। এরপর কল্পবিজ্ঞানের শাখায় আসেন আর-এক মহারথী। তিনি এইচ. জি. ওয়েল্‌স। জানা-অজানা বিজ্ঞানভাবনার সমন্বয়ে ও শক্তিশালী কল্পনার প্রয়োগে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে ওয়েল্‌স এনেছিলেন জোয়ার। জুল ভের্ন-এর মতো ওয়েলস-এরও সংশয় ছিল মানুষ কি তার নিজের সৃষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? ওয়েল্‌স-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প — দ্য টাইম মেশিন, দ্য আইল্যান্ড অব ডক্টর মরো, দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অনেক 'কল্পবিজ্ঞানমূলক' গল্প লেখা হলেও সে সবের বিশেষ সমাদর ছিল না। অ্যামেজিং স্টোরিজ, স্টেলা এইরকম কিছু পত্রিকার হাত ধরে কল্পবিজ্ঞান তখন স্তিমিতভাবে বেঁচে ছিল। অতঃপর কল্পবিজ্ঞানের বিষয় পরমাণু বোমা, বিমান, রঙিন টিভি, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট ব্যবস্থা বাস্তবে রূপান্তরের পর কল্পবিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়।

অবশেষে কল্পবিজ্ঞানকে আজগুবির জগৎ থেকে টেনে বিজ্ঞানভিত্তিক করেন জন উড ক্যাম্পবেল। 'অ্যাস্টাউনডিন স্টোরিজ' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্পগুলিকে শক্তিশালী ও বাস্তবমুখী করেন। তৈরি করেন একটা শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — অ্যাসিমাভ, রবার্ট হাইনলাইন, ফিলিপ কে ডিক প্রমুখ। এরপর কল্পবিজ্ঞানের শাখায় আসেন আর-এক শক্তিশালী লেখক, আর্থার সি. ক্লার্ক। উল্লেখ্য, ক্লার্কের কল্পনায় অনুপ্রেরণা পেয়েই অনেক বিজ্ঞানী সেই বিষয়ে আবিষ্কারের

হাত লাগিয়েছিলেন। এঁরা ছাড়াও আরও কয়েকজন কল্পবিজ্ঞান লেখককে পাওয়া গেল বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়। তাঁরা হলেন রে ব্র্যাডবেরি, ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্ট, জ্যাক উইলিয়ামসন, ক্যারেল ক্যাপেক, পিটার ফিলিপ্‌স প্রমুখ।

বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উনিশ শতকের শেষে বাংলা সাহিত্যে শুরু হয় কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাস। ১৮৯৬ সালে 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' গল্পটি লিখে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। গল্পটি নিখাদ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। এখানে আছে বিজ্ঞানের সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠতান তত্ত্ব। গল্পটি পরে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে স্থান পেয়ে 'পলাতক তুফান' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কারও পায়। এরপর ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক জগদানন্দ রায় লেখেন একটি কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্প 'শুক্রভ্রমণ'। পরে গল্পটি 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সালে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর লেখা গল্পের অনুবাদ।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান রচনায় মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখেন সুকুমার রায়। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প — 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। সুকুমার রায় মূলত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আর্থার কন্যান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' থেকে। কন্যান ডয়েলের গল্পের মতো সুকুমার রায়ের গল্পেও পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সন্ধান। তারপর কল্পবিজ্ঞান শাখার অবদান রাখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার প্রমুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিঁপড়ে পুরাণ, কুহকের দেশে, পৃথিবী ছাড়িয়ে, ময়দানের দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য জুল ভের্নের রচনাই ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞান রচনার অনুপ্রেরণার মূলে। কল্পবিজ্ঞানের ধারায় হেমেন্দ্রকুমারের অসম্ভবের দেশে, অমানুষিক মানুষ, মায়াবতীর মায়াকানন উল্লেখযোগ্য। বিশ্বসাহিত্যে অ্যামেজিং স্টোরিজ, অ্যাস্টাউনডিন ইত্যাদি পত্রিকার মতো কল্পবিজ্ঞানের ধারাকে উৎসাহিত করতে সেকালে বাংলা সাহিত্যেও অনেক পত্রপত্রিকার উদ্ভব ঘটেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আশ্চর্য!, ফ্যানটাস্টিক, বিস্ময় সায়েন্স ফিকশন ইত্যাদি। এইভাবে জগদীশচন্দ্র বসু থেকে হেমেন্দ্রকুমার রায় অবধি 'কল্পবিজ্ঞান' ধারার গতি ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়। এরপরেই 'কল্পবিজ্ঞান' শাখাকে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যজিৎ রায়।

তবে এটা ঠিক, বিভিন্ন লেখক ও পত্রপত্রিকা প্রাক্-সত্যজিৎ পর্বে কল্পবিজ্ঞানের স্রোত ধরে রেখেছিলেন। এঁদের দ্বারা কখনোই পরিণত কল্পবিজ্ঞানের জোয়ার আসেনি। সেই জোয়ার আনার অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৬১-এর সেপ্টেম্বরে 'সন্দেশ' পত্রিকার হাত ধরে কল্পবিজ্ঞান শাখায় আসেন তিনি। গল্পের নাম 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। ডায়ারির আকারে পরিবেশিত এই গল্পের কথক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। পরে গল্পটি নিউস্ক্রিপ্ট থেকে প্রকাশিত 'প্রোফেসর শঙ্কু' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে ওই

গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠ কিশোর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পুরস্কৃত হয়। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম রচনা ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি’ থেকে জানা যায়, প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু একজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক। জলে-স্থলে-মহাকাশে তাঁর অভিযান। পরবর্তী শঙ্কু কাহিনি থেকেই বোঝা যায়, গল্পের নায়ক ক্রমশ একটা সিরিজের চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর প্রথম ডায়ারি পড়েই বিজ্ঞানিকের পরবর্তী ডায়ারিগুলি পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে পাঠকেরা। অবশেষে শঙ্কুর পরবর্তী ডায়ারি দেখার আশায় পাঠকেরা অবিশ্রান্তভাবে চিঠি পাঠাতে থাকে সন্দেশ পত্রিকার দফতরে। এমনকি অনেকে সশরীরে সন্দেশের দফতরে হাজির হয়। আর পাঠকের তাগিদেই সত্যজিতের কলমে প্রোফেসর শঙ্কুর পুনরায় আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে শঙ্কুর মোড়কে পাঠকদের অনেক ‘কল্পবিজ্ঞানের গল্প’ উপহার দেন তিনি।

প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গী বিশ্বস্ত চাকর প্রহ্লাদ আর বেড়াল নিউটন। কয়েকটি অভিযানে পেয়েছি তাঁরই প্রতিবেশী অবিনাশচন্দ্র মজুমদার আর মাকড়দহের শ্রী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসকে। শঙ্কুর অভিযানের সঙ্গে মিশে গেছে ভূতপ্রেত, তন্ত্রমন্ত্র, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স, আরও অনেক কিছু। ভিশুয়াল ডিটেলের প্রাচুর্যে বাস্তবতার আবহাওয়া এনে সত্যজিৎ কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলিকে ওয়ান্ডারফুল করেছেন। সহজ সরল ঘটনাবলিও সুস্পষ্ট দৃশ্যকল্পের দ্বারা শঙ্কু কাহিনি হয়েছে অসাধারণ। প্রয়োজনে কিংবদন্তিকে কাজে লাগিয়ে, গল্পের ভূগোলের সুনির্বাচন শঙ্কু-কাহিনি রূপান্তরিত হয়েছে সিনেমায়।

বাংলা সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞান শাখায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। বিজ্ঞান গবেষণায় ব্রতী একনিষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী। সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন এই আবিষ্কার-পাগল বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। এই শঙ্কুর হাত ধরেই কল্পবিজ্ঞান শাখায় প্রবেশ করেন সত্যজিৎ রায়।

প্রোফেসর শঙ্কুর দ্বিতীয় কাহিনি ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়’-এর ভূমিকা থেকে জানা যায়, শঙ্কু বৃত্তান্তের আরও অনেক তথ্য। যেমন সত্যজিৎ রায় অনেক অনুসন্ধানের পর প্রোফেসর শঙ্কুর বাড়ির সন্ধান পান। সেখানে শঙ্কুর ল্যাবরেটরি দেখে তিনি তো রীতিমতো অবাক! সেখানে কাগজপত্র ঘেঁটে শঙ্কুর কিছু গবেষণাপত্রেরও সন্ধান পান। আর পাওয়া যায় ২১টা ডায়ারি। তাতে আছে পৃথিবীর ২১টা জায়গায় প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযানের কাহিনি। তারপরে পাওয়া যায় আরও কয়েকটা ডায়ারি। সবকটি মিলে ৩৮টি সম্পূর্ণ এবং ২টি অসম্পূর্ণ ডায়ারি। সেগুলি সত্যজিৎ রায় গিরিডি থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে সন্দেশ, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠকদের অনুরোধে প্রকাশ করেন। প্রোফেসর শঙ্কুর নিজের লেখা ডায়ারিগুলি পড়লে তার চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুমান করা যায়।